‘কত টন খাদ্য প্রয়োজন, কত আছে সে হিসাব সরকারের আছে বলে মনে হয় না’

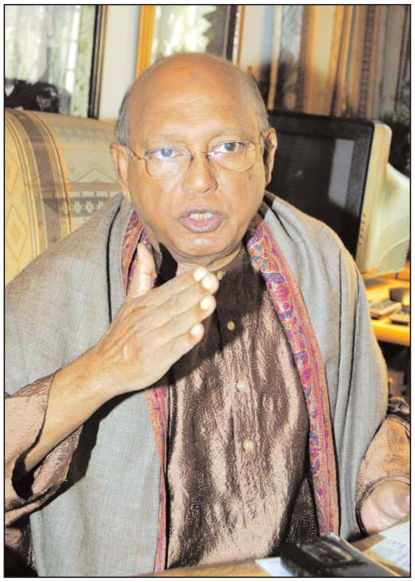

তোফায়েল আহমেদ *প্রেসিডিয়াম সদস্য, আওয়ামী লীগ*

প্রায় এক বছর পর রাজনৈতিক দলগুলো আবার তৎপর হয়ে উঠতে চাইছে চলমান সংলাপকে উপলক্ষ করে। নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সংলাপ শেষ হওয়ার পরপরই সরকারের সঙ্গে সংলাপে যাবে দলগুলো। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলের সংলাপে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করছেন তোফায়েল আহমেদ। সাপ্তাহিক ২০০০-এ এক সাক্ষাৎকারে রাজনীতির বর্তমান গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন এই প্রাজ্ঞ রাজনীতিক। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **বদরুল আলম নাবিল**

সাপ্তাহিক ২০০০ : পাকিস্তানের সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফলাফল এবং এর মাধ্যমে যে পরিবর্তনের সূচনা হচ্ছে তার কী প্রভাব আমাদের রাজনীতিতে পড়তে পারে বা আমাদের জন্য এতে কী বার্তা আছে?

তোফায়েল আহমেদ : পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হবার পর থেকেই সে দেশের মানুষ একটি গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু ষড়যন্ত্র সেই শুরু থেকেই হয়ে আসছে, ফলে কোনও সরকারই তার মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেনি। দীর্ঘদিন ধরে মানুষ গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা চেয়ে আসছে, তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এই ১৮ তারিখের নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে।

কিন্তু এখনই যে পাকিস্তানে সবকিছু শেষ হয়ে গেছে তা নয়। ওখানে এত বেশি জঙ্গি উত্থান হয়েছে এবং সাম্প্রদায়িক শক্তি সঞ্চার করেছে সেটাকে শেষ করতে হবে– সেই লক্ষ্যই সামনে রেখে মানুষ ভোট দিয়েছে; যার জন্য মৌলবাদীদের জোট মুত্তাহিদা মজলিসে আমল, যারা এর আগে ৫০টি আসনের অধিকারী ছিল তারা মাত্র ৫টি আসন পেয়েছে। সীমান্ত প্রদেশে যাদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ ছিল তারা সেখানে আসন হারিয়েছে। তার মানে পাকিস্তানের মানুষ জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে, তারা সাম্প্রদায়িক বা ধর্মভিত্তিক রাজনীতি চায় না। আমরা কি পাকিস্তান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা? আমাদের এখানেও তো জঙ্গিবাদের উত্থান হয়েছিল, যা এখনও শেষ হয়ে যায়নি। সুতরাং পাকিস্তানের নির্বাচনের মাধ্যমে একটি জিনিস এই বিশ্ববাসীর কাছে প্রমাণ করেছে যে, একটি দেশের শান্তি, স্থিতিশীলতা নির্ভর করে একটা অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ওপর। জঙ্গি তৎপরতা যে দেশে আছে সে দেশে স্থিতিশীলতা থাকে না, গণতন্ত্র থাকে না, শান্তি থাকে না, সুখ থাকে না। এগুলো থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। তবে আমি মনে করি, পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের তুলনা করা সমীচীন হবে না। কারণ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। এত কিছুর মধ্যেও আমরা আমাদের গণতান্ত্রিক চিন্তাচেতনা ধরে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছি, যদিও আমাদের দেশে বিভিন্নভাবে পরিবর্তন হয়েছে। তবে আমরা এখন যে জায়গায় এসে পৌঁছেছি এতে সমস্ত জাতি তো জঙ্গি উত্থানের বিরুদ্ধে। সবাই গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এক ও অভিন্ন হয়েছে, শুধু স্বাধীনতাবিরোধীরা ছাড়া। এটাকে আমি শুভ লক্ষণ মনে করি এবং বিশেষ করে আমি মনে করি আজকের পাকিস্তানের নির্বাচন, থাইল্যান্ডের নির্বাচন থেকে নিশ্চয় আমরা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারব।

২০০০ : আপনি জঙ্গিবাদ প্রসঙ্গটাকে হাইলাইট করে বলছেন, কিন্তু গণতন্ত্রে হস্তক্ষেপের বিষয়টি আমাদের এখানেও বারবার হয়েছে। এখনও একটা অগণতান্ত্রিক শাসনের অধীনে আমরা আছি। তো, সেখানে আমাদের কী শিক্ষণীয়?

তোফায়েল : আমাদের আর অতীতে ফিরে যাওয়া যাবে না। সে জন্য আমাদেরও নতুন করে শুরু করতে হবে। আমাদের রাজনীতিতে হানাহানি ছিল, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ছিল। একটি প্রতিহিংসার মনোভাব থাকে, তা থেকে আমাদেরকে মুক্তি পেতে হবে। জাতীয় সংসদকে সব কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে রূপান্তরিত করতে হবে। যিনি সরকারে থাকবেন তাকেও ধৈর্য, সহনশীল, নমনীয় হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হবে। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু একজন বিদ্বান, পণ্ডিত ছিলেন। তিনি শুধু প্রধানমন্ত্রীই ছিলেন না, লেখাপড়া, শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞানে ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, বিরোধী দলেরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ভূমিকাটা হলো সরকারের ভুলত্রুটিগুলো ধরিয়ে দেবে।

আমি ভারতের পার্লামেন্টে দেখেছিলাম, নরসীমা রাও যখন প্রধানমন্ত্রী তখন তার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেছিলেন তৎকালীন সাবেক বিজেপির নেতা পরে প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ি। কঠিন বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কিন্তু এক ঘণ্টা নরসীমা রাও শুনেছেন, তারপর যেটা গ্রহণ করা দরকার সেটা গ্রহণ করেছেন এবং যেটা প্রত্যাখ্যান করা দরকার সেটা বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আমি বিরোধী দলে থাকলে সরকারের সমালোচনা করব, জাতীয় ইস্যুতে সরকারকে সমর্থন করব– আমাদের দেশে সেটা নেই। আমরা সবকিছুতেই বিরোধিতা করি। আবার সরকারে থাকলে সবকিছু ভালো মনে করি, বিরোধী দলে থাকলে সবকিছু খারাপ। আমাদের গঠনমূলক রাজনীতি শুরু করা উচিত এবং ১/১১-এর পরিবর্তনের মাধ্যমে আমি মনে করি সেই সুযোগটা এসেছে।

বঙ্গবন্ধুর সময়ে দেখেছি, মতের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও অপরের প্রতি বঙ্গবন্ধু মমত্ববোধ, শ্রদ্ধা, ভালবাসা ছিল অফুরান। সেই সময় সবুর খান কারাগার থেকে চিঠি লিখেছিলেন- ‘প্রিয় মুজিব, তুমি আজ স্বাধীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী। ভাবতে কত ভালো লাগে যে, বাংলার প্রধানমন্ত্রী আমারই স্নেহের শেখ মুজিব। কিন্তু কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বসে আমি যখন ভাবি, বাংলার প্রধানমন্ত্রী আমারই প্রিয় শেখ মুজিব আর সেই বাংলার বৃদ্ধ সবুর খান আজও কেন কারাগারে, আমি তার উত্তর খুঁজে পাই না।’ এই চিঠি পাওয়ার পর বঙ্গবন্ধু সবুর খানকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, কারাগার থেকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে

সবুর খান বঙ্গবন্ধুর প্রতি কটূক্তি করেননি, সম্মান করেই কথা বলেছেন। এসব আমাদের নেই, এসব জায়গায় আমাদের ফিরে আসতে হবে। সামাজিক সম্পর্ক এক জিনিস আর রাজনীতি অন্য জিনিস।

২০০০ : আপনি যে বললেন রাজনৈতিক সহনশীলতার কথা, ১/১১-এর পেছনে না ফিরে যাবার কথা বলছেন...?

তোফায়েল : ১/১১-এর আগে ফিরে না যাবার পেছনে একটা ব্যাখ্যা আছে। ১১ জানুয়ারির আগে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা বাংলাদেশে আছে, অনেক সিদ্ধান্ত আছে, অনেক উন্নয়ন আছে। ১/১১ বলতে ঐটুকু মনে করা হয় যে, রাজপথে হানাহানি, মারামারি, হত্যা, অবরোধ, সংঘর্ষ ইত্যাদিতে আমরা ফিরে যাব না। কিন্তু ১/১১-এর আগে গত ১৫ বছরে অর্থনৈতিক, সামাজিক যে উন্নয়ন হয়েছে সেটা কিন্তু অন্যান্য সময়ের চেয়ে বেশি।

২০০০ : মূলত রাজনৈতিক সহনশীলতার ওপর আপনি জোর দিয়েছেন কিন্তু আপনারা যারা আগে রাজনীতি করতেন, তারাই এখন করছেন, ভবিষ্যতেও করবেন। আপনারা অতীতে পারেননি, ভবিষ্যতে পারবেন তার গ্যারান্টি কী?

তোফায়েল : বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুরই পরিবর্তন হয়। পৃথিবীর বহু দেশেই সংঘর্ষ হয়েছে, ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে, তার পরে ঐকমত্য হয়েছে। আজকের পাকিস্তানের কথা চিন্তা করেন, বেনজির ভুট্টো, পিপলস পার্টি ও নওয়াজ শরিফের দলে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। তারপরেও তারা একসঙ্গে সরকার পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। সুতরাং পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনমানসিকতারও পরিবর্তন হয়। একটা জিনিস সবাই উপলব্ধি করবেন, সবকিছুরই ঊর্ধ্বে আমার দেশ, আমার প্রিয় মাতৃভূমি। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে যে দেশ প্রতিষ্ঠা হয়েছে, সেই মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য কেন নিজেদের স্বার্থ বিসর্জন দিতে পারব না। তাই আমাদের যদি ভুল থেকে থাকে, যদি ভুল করে থাকি, যদি কোনও ব্যর্থতা থাকে সেটা সংশোধন করতে দোষ কোথায়।

২০০০ : একটা রোডম্যাপ ঘোষণা হয়েছে। এটা নিয়ে জনমনে নানা সংশয় আছে। প্রধান উপদেষ্টা, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও সেনাবাহিনীর প্রধান জোর দিয়ে বলছেন, ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন হবে, তবু এটাকে মানুষ আস্থায় নিতে পারছে না। এর কারণ কী?

তোফায়েল : নির্বাচনের বিকল্প কিছু নেই। একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার যখন দায়িত্ব গ্রহণ করে, তার মূল লক্ষ্য হলো অবাধ ও স্বচ্ছ নির্বাচন উপহার দেওয়া। সেটা লক্ষ্য রেখেই নির্বাচন কমিশন একটা রোডম্যাপ ঘোষণা করেছে এবং আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, এই রোডম্যাপ বাস্তবায়িত হবে। কারণ এর বিকল্প নেই এবং আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এই রোডম্যাপকে সমর্থন করেছি। তারা ২ বছর সময় নিল (যদিও এটা অনেক বেশি সময়), আমরা এটাও মেনে নিয়েছি। রোডম্যাপ অনুসারে তারা বলেছেন সংলাপ তিন মাসের মধ্যে শেষ করবেন, কিন্তু শেষ করতে পারেননি। এটাও আমরা মেনে নিয়েছি।

আমরা খুবই সতর্ক। আমরা চাই না নেতিবাচক কোনও আচরণ দিয়ে দেশ আবার একটা অনিশ্চয়তার দিকে যাক, সেই দিকে আমরা পা দিতে চাই না। প্রধান উপদেষ্টা, প্রধান নির্বাচন কমিশনার আর একজন সেনাপ্রধান, তিনজনই জাতির সামনে অঙ্গীকার করেছেন যে তাদের ঘোষিত রোডম্যাপ অনুসারে ২০০৮ সালের মধ্যে নির্বাচন হবে। মানুষের মধ্যে যে সংশয় আছে, অবিশ্বাস আছে কাজের মাধ্যমেই তা দূর করতে হবে। এখন দ্বিতীয় দফা যে সংলাপে যাব, তাতে কমিশনের খসরা প্রস্তাবের সঙ্গে অধিকাংশ ব্যাপারে আমরা একমত হয়েছি। যেটুকু আমরা একমত হইনি, হয়তো আমরা একমত হয়ে যাব। তাহলে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে অবাধ নির্বাচনের, প্রশ্নে যে দাবিগুলো উত্থাপন করেছিলাম এবং তারা যে প্রস্তাব আমাদের সামনে পেশ করেছেন আমরা সে ব্যাপারে একমত হলে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য কালো টাকা ও সন্ত্রাসমুক্ত, স্বচ্ছ, গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

২০০০ : রোডম্যাপ অনুসারেও যদি নির্বাচন হয়, তাতেও আরও আট মাস। সরকার যেভাবে চলছে; দ্রব্যমূল্য, মূল্যস্ফীতি, বিনিয়োগ মিলিয়ে দেশের অর্থনীতি যে জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে তাতে এভাবে আট মাস চালিয়ে নেওয়া হবে আত্মঘাতী– এরকম অভিমত অনেকের। এ ক্ষেত্রে আপনার অভিজ্ঞতা কী বলে?

তোফায়েল : কিন্তু উপায় তো নেই। আমরা বলেছিলাম দ্রুত ভোটার তালিকা সম্পন্ন করে আগে আগে নির্বাচন দিয়ে দিতে। ডিসেম্বরের আগেই যদি নির্বাচন দিতে পারে তাহলে তা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য এবং দেশের জন্য ভালো হবে। সিডর ও বন্যার পরে এক অভিন্ন হয়ে আমরা সবাই দুর্গত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। সুতরাং নির্বাচনের জন্য সবাই যদি একমত হয়ে কাজ করি, তাহলে আমরা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব। ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনও তাড়াহুড়া নেই। আমি যখন বাণিজ্যমন্ত্রী ছিলাম, তখন জিনিসপত্রের দাম বাড়তে দিইনি। আবার যখন শিল্পমন্ত্রী ছিলাম, তখন সারের সঙ্কট হয়নি। আমরা রাজনীতির মধ্যে ভুলত্রুটির পরেও দক্ষতার সঙ্গে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছি। আমাদের সুবিধা হচ্ছে, আমরা ঘুম থেকে ওঠার পরে দেশের মানুষের সাক্ষাৎ পাই। তাদের সুখ-দুঃখের কথা আমি শুনি, দেশের কী অবস্থা সেটা জানতে পারি। এতে সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হয়। ১/১১-এর পরে যারা মিডিয়ায় রাজনীতিকদের কঠোর সমালোচনা করেছে, আবার এখন যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম, সার সংকট, চালের সংকট– সবকিছুরই কঠোর সমালোচনা হচ্ছে। আগে আমরা সমালোচিত হয়েছি, এখন তারা সমালোচিত হচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষের চিন্তা-চেতনা চমৎকার, অতুলনীয়। সঠিক সময়ে বাংলাদেশের মানুষ সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে কোনও দিন ভুল করেনি এবং ভবিষ্যতেও করবে না। সেই জন্যই আমার মধ্যে কোনও শঙ্কা নেই এবং রোডম্যাপ অনুসারে নির্বাচন হবে। যেটুকু মানুষের মধ্যে শঙ্কা, অবিশ্বাস আছে, এটা দূর করার দায়িত্ব তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশনের।

আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনা বলে দিয়েছিলেন– মিস্টার তোফায়েল আহমেদ, যদি সারের সঙ্কট হয় তবে মন্ত্রিত্বের সঙ্কট হবে। আমিও তার জবাবে বলেছিলাম– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সঙ্কট হলে আমি বিদায় নেব

২০০০ : আপনি দ্রব্যমূল্যর প্রসঙ্গ তুলেছেন এবং আপনি বাণিজ্যমন্ত্রী থাকাকালে দ্রব্যমূল্য তুলনামূলক কম ছিল। এ ক্ষেত্রে আপনারা কী কৌশল অবলম্বন করতেন? এখনই বা সমস্যাটা কোথায়?

তোফায়েল : শুধু কম ছিল না, আমরা বাড়তেই দিইনি। '৯৬ সালের ২৩ জুন শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলাম, তখন যে দাম ছিল তা থেকে আমরা কমিয়েছি। চিনির দাম এক দিনের জন্য বাড়তে দিইনি। কারণ শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে সুগার কর্পোরেশনের মাধ্যমে চিনি আমদানি করতাম। আবার ডিলারদের মাধ্যমে সেটা বণ্টন করতাম। ফলে আমাদের শিল্পগুলো বেঁচে গিয়েছিল। বিদেশ থেকে আমদানি করে কোটি কোটি টাকা লাভ করতাম। ঐ লাভের টাকা দিয়ে দেশীয় শিল্পের লোকসান মিটিয়ে লাভ থাকত। কিন্তু জোট সরকার ক্ষমতায় এসে ব্যক্তিমালিকানায় চিনি আমদানির সুযোগ করে দেয়ায় চিনির কলগুলো শেষ হয়ে গেল। মানুষও চিনি ৭০ টাকায় খেল। আমরা তা করিনি। সারের ক্ষেত্রে বিএনপির ডিলারদেরও আমরা বাতিল করিনি। বিএনপির আড়াই হাজার ডিলারও আমরা রেখেছি, একজনকেও সরাইনি। আবার নতুন করে এক হাজার ডিলার নিয়োগ দিয়েছিলাম। প্রতি জুন মাসে আমরা সিদ্ধান্ত নিতাম আমাদের কতটুকু প্রয়োজন, কতটুকু উৎপাদন হয়। যেটুকু ঘাটতি সেটুকু আমরা আমদানি শুরু করতাম। কত টন প্রয়োজন,

কতটুকু আছে সেই সিদ্ধান্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে আছে আমার মনে হয় না। খাদ্যের ব্যাপারে বিশেষ করে চাল, '৯৮-এর ভয়াবহ বন্যার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিমন্ত্রী ও আমি বসে একসঙ্গে সিদ্ধান্ত নিলাম কত টন আমাদের ঘাটতি। দেখা গেল ৪০ লাখ টন। তখন আমরা ৫৪ লাখ টন আমদানি করেছিলাম। এর পরে তো বাম্পার ফলন হলো এবং ঘাটতির বাংলাদেশ উদ্বৃত্তের দেশে রূপান্তরিত হয়। ২৬ লাখ টন ধান গোডাউনে রেখে বিদায় নিলাম ১৫ জুলাই ২০০১-এ। আজকের সেই দেশই খাদ্যের ঘাটতির দেশে রূপান্তরিত হয়েছে।

সুতরাং উৎপাদন বাড়েনি এবং এবারের উৎপাদন কতটুকু সেটা জানি না। সিডর ও বন্যার পরে কত লাখ টন ঘাটতি হবে সেই হিসাব আছে বলে জানা নেই। পাঁচ লাখ টন খাদ্য ভারত থেকে দেওয়ার কথা ছিল। এখন পর্যন্ত বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে শুনিনি। সুতরাং রাজনৈতিক সরকার শঙ্কিত থাকে, আতঙ্কিত থাকে যদি সঙ্কট হয়। আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনা বলে দিয়েছিলেন– মিস্টার তোফায়েল আহমেদ, যদি সারের সঙ্কট হয় তবে মন্ত্রিত্বের সঙ্কট হবে। আমিও তার জবাবে বলেছিলাম– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সঙ্কট হলে আমি বিদায় নেব।

> **মনোনয়ন বাণিজ্য হয়, নির্বাচনের সময় হঠাৎ একজন টাকার মালিক এসে মনোনয়ন নিয়ে নেয়, আমরা এটা বন্ধ করব। যে কেউ দলের সদস্য তিন বছর না থাকলে মনোনয়ন পাবে না**

আমরা ১৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পেয়েছিলাম আবার ৪২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ রেখে বিদায় নিলাম। কিন্তু বিগত ৫ বছরে ১ মেগাওয়াটও যোগ হয়নি। '৭৫-এর পরে যতগুলো সরকার হয়েছে যেকোনও লোক বিতর্কে আসুক আমি তথ্য দিয়ে দেখাব '৯৬ থেকে ২০০১-এ সেই সময়ই ছিল সবচেয়ে সফল। এর মধ্যেও আমাদের ভুলত্রুটি ও ব্যর্থতা আছে। কিন্তু সফলতার পরিমাণ অনেক অনেক বেশি। বিনিয়োগ ৩.৮ বিলিয়ন ডলার নিয়ে শুরু করলেও ৭ বিলিয়ন ডলার রেখে বিদায় নিয়েছি। সিমেন্ট উৎপাদন ছিল ৯ লাখ টন, আবার যখন ক্ষমতা হাস্তান্তর করি তখন হয় ৬০ লাখ টন। আজকে শিল্প খাতে যে বড় বড় ব্যবসায়ী আছেন, তাদের জিজ্ঞাসা করেন কীভাবে আমরা ব্যবসায়ীদের সাহায্য করেছি।

২০০০ : আপনারা নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সংলাপ করলেন। এ দেশে সংলাপের অভিজ্ঞতা অতীতে ভালো না। এবার ভিন্ন কিছু মনে হয়?

তোফায়েল : ভিন্নতা তো একটা আছে। অতীতে সংলাপ হতো দলে দলে, আমরা বঙ্গভবনে গিয়ে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ যখন রাষ্ট্রপতি, তার সঙ্গে সংলাপ করেছি। তার একটা দলীয় চিন্তা-ভাবনা ছিল। বিদেশি মেহমান পর্যন্ত এসেছিলেন আমাদের দেশে। এক টেবিলে বিএনপি বসেছে, অন্য টেবিলে আওয়ামী লীগ। তারপর জলিল সাহেব ও মান্নান ভূঁইয়ার সংলাপে নির্বাচন কমিশনে যে পরিবর্তন হলো, সেই পরিবর্তনের কথাই বলা হয়েছিল কিন্তু ক্ষমতাসীন দল তা করেনি। এবার তো আমরা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপ করছি না। আমি মনে করি নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ এবং তাদের প্রতি আমাদের বিশ্বাস ও আস্থা আছে। ঠিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারকেও হতে হবে নিরপেক্ষ। লক্ষ্য এক এবং অভিন্ন সেটা হচ্ছে আমরা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই। সুতরাং লক্ষ্য যখন এক; লক্ষ্যে পৌঁছাতে আমাদের সহজ হবে। লক্ষ্য কম টাকায় ত্যাগী আদর্শবান নেতারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে– এমন পরিবেশ তৈরি করা। আগে কোটি কোটি টাকা খরচ হতো অথচ সীমানা ছিল পাঁচ লাখ। এই পাঁচ লাখ বাস্তবসম্মত না আবার কোটি কোটি টাকাও গ্রহণযেগ্য না।

দলগুলোর চাঁদা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়, আমরা বলছি না কোথা থেকে টাকা পেলাম, কে দিল। নির্বাচন কমিশনকে বছরে বছরে তার হিসাব দিতে হবে, আমরা এতে একমত। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্র নেই, আমরা বলেছি ভবিষ্যতে দলের নেতা নির্বাচিত হবে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে, এমনকি প্রয়োজন হলে ব্যালটে। সেই তৃণমূল পর্যায় থেকে। মনোনয়ন বাণিজ্য হয়, নির্বাচনের সময় হঠাৎ একজন টাকার মালিক এসে মনোনয়ন নিয়ে নেয়, আমরা এটা বন্ধ করব। যে কেউ দলের সদস্য তিন বছর না থাকলে মনোনয়ন পাবে না। শুধু সদস্য নয়, তিন বছর দলের কাজ করেছেন কিনা তাও দেখা হবে। দ্বিতীয়ত, মনোনয়ন দেওয়ার মালিক আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি বোর্ডই শুধু নয়, তৃণমূল থেকে মতামত আনতে হবে যে কে এই নির্বাচনী এলাকায় মনোনয়নের যোগ্য।

২০০০ : আপনাদের গঠনতন্ত্রে যেটুকু গণতন্ত্র ছিল, সেগুলোই তো আপনারা এর আগে বাস্তবায়ন করতে পারেননি। এখন আপনারা এত বড় বড় ওয়াদা করছেন যে তৃণমূল পর্যায় থেকে নেতা নির্বাচন করবেন, সব সিদ্ধান্ত গণতান্ত্রিকভাবে হবে। এগুলো আসলে কতটা সফল হবে?

তোফায়েল : আমরা তো ইতিমধ্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি। জরুরি অবস্থা জারির আগে আওয়ামী লীগের প্রায় ৫৫টি জেলায় আমাদের সম্মেলন হয়েছে। অধিকাংশ জেলায় ভোটাভুটির মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি নির্বাচিত হয়েছে। এমনকি ইউনিয়নে পর্যন্ত ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছে। এবার নির্বাচন কমিশনে যে রাজনৈতিক দল নিবন্ধন পাবে তার মধ্যে এটা একটা শর্ত। সুতরাং আগে তো শর্ত ছিল না, আগে করতে পারতাম, না-ও পারতাম। যে রাজনৈতিক দল নিবন্ধন পাবে তার নেতা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হবে।

আরও একটি দৃষ্টান্ত আমাদের জিল্লুর রহমান সাহেব ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, কিন্তু দলীয় ফোরামে একমত না হয়ে আমরা কোনও সিদ্ধান্ত নিই না।

২০০০ : দলগুলো পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ এবং একক ক্ষমতা থেকে মুক্ত করাও এজেন্ডা। এটা থেকে তো দল এখনও মুক্ত হতে পারেনি।

তোফায়েল : পারিবারতন্ত্র বলতে কিছু আছে বলে আমি মনে করি না। তবে দোষটা তো আমাদেরও। আওয়ামী লীগের সম্মেলন যখন হয়, কাউন্সিলররা যখন আসে আমরাই তো নেত্রীর ওপর দায়িত্ব দিয়ে বিদায় নিই। এই যে একক ক্ষমতা দিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করেছি, সেখান থেকে আমরা ফিরে আসব।

সুতরাং আওয়ামী লীগ ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে নির্বাচনের পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করে যাচ্ছে কিন্তু এক জায়গায় আমরা আপসহীন। সেটা হলো স্বাধীনতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধী সম্প্রদায়িক উত্থানের সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের কোনও ছাড় নেই।

জিয়াউর রহমান দালাল আইন প্রত্যাহার করে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭৫-এ সবাইকে কারাগার থেকে মুক্ত করেছেন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সাংবিধানিক ভিত্তি এখনও আছে। সুতরাং বিচারের ব্যবস্থাও আছে। এখন তো জামায়াত ছাড়া সবাই স্বাধীনতাবিরোধীদের বিচারের ব্যাপারে, তাদের নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে একমত। জাতীয় এই ঐকমত্যকে অবহেলা করা ঠিক হবে না।

শ্রুতিলিখন : আপেল মাহমুদ

পপলুলার